বলা ও না-বলা কথা

বলা ও না-বলা কথা

মনজুরুল আহসান খান

আদর্শ

প্রকাশক: **আদর্শ**
৩৮ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০
(+০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭৯৩২৯৬২০২, ০১৭১০৭৭৯০৫০

hello@adarsha.com.bd www.adarsha.com.bd
myAdarsha my.Adarsha c/myAdarsha company/adarsha

বলা ও না-বলা কথা
২য় মুদ্রণ: ১৫ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ; ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
১ম প্রকাশ: ৩০ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ; ১৪ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

© মনজুরুল আহসান খান
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা: আদর্শ প্রিন্টার্স
রকমারিতে আদর্শ'র বই: www.rokomari.com/adarsha

Bala O Na-bala Katha (Published in Bengali)
by *Manzurul Ahsan Khan*
Published by Adarsha
38 P. K. Ray Road, Banglabazar (1st floor), Dhaka 1100
ISBN: 978-984-97287-1-9

উৎসর্গ

আকাঙ্ক্ষিত সেই নতুন প্রজন্মের বাম নেতৃত্বের প্রতি
মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পূর্ণ স্বাদ পেতে যে নতুন প্রজন্মের বাম নেতৃত্বের অপেক্ষায় বাংলাদেশ

মনজুরুল আহসান খানের এই ছবিটি তুলেছেন শংকর সাঁওজাল

ভূমিকা

আমি বেঁচে থাকতেই আমার স্মৃতিকথা *বলা ও না-বলা কথা* বই আকারে প্রকাশিত হবে, এটা আমার ভাবনার মধ্যে ছিল না। নানা কারণে পার্টি থেকে প্রায় তিন বছর হলো অনেকটাই নিভৃতে চলে যাওয়ার পর থেকে আমি আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, জীবন ও পরিবার, পার্টি রাজনীতির আনন্দ-বেদনার স্মৃতিময় ঘটনাবলি লিখতে শুরু করি। লিখতে গিয়ে মাঝেমধ্যে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। থমকে গেছি। আবার লেখা শুরু করেছি। এই স্মৃতিকথায় আমি যে পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছি, তার সাধারণ বর্ণনা আছে।

যুবক বয়সে নটরডেম কলেজে ছাত্র সংগঠন করার ওপর নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও ছাত্রদের দাবি নিয়ে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়। ছাত্র থাকা অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিক আন্দোলন, সমাজ বিপ্লব ও সিপিবির রাজনীতিতে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণের শুরুর কথা ব্যক্ত করেছি। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব, উঁচু মানের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ, বেতিয়ারা যুদ্ধসহ রণাঙ্গনের যুদ্ধ, যা আমার মনপ্রাণকে এখনও আলোড়িত করে, তার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছি। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর বাংলাদেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা, আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতা, ১লা জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে গুলির ঘটনা ও পরবর্তী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নেপথ্যের কাহিনি, সিপিবি-ন্যাপের ব্যর্থতা-সীমাবদ্ধতা, আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নিয়ে আমার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছি। বাকশাল গঠনে সিপিবির দায়, সিপিবির ভেতরে বাকশাল প্রশ্নে বিতর্ক, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মতামত ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার ষড়যন্ত্র, প্রেক্ষাপট ও এই নৃশংস রাজনৈতিক হত্যার প্রতিবাদ সংগঠিত করার নেপথ্যের ঘটনাবলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনকালে সিপিবির ওপর সরকারের খড়্গহস্ত, গ্রেফতার, নির্যাতন, নীতি-নৈতিকতা-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সিপিবির আপস, সমঝোতার নির্বাচনে নৌকা মার্কা নিয়ে পাঁচটি সংসদ আসন প্রাপ্তি, ফরহাদ ভাইয়ের মৃত্যু, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সিপিবিতে বিভাজনের নেপথ্যের ঘটনাবলি তুলে ধরা হয়েছে। বিভাজন পরবর্তী পার্টি পুনর্গঠন, সিপিবির জনসভায় বোমা

হামলা, খালেদা-হাসিনার শাসনামল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামল, হাসিনার পুনরায় ক্ষমতায় আসা, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ফাঁসিতে ঝোলানো, গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে আছে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি অবস্থায় আমাকে আর্মির ইন্টারোগেশনের সম্পূর্ণ বিবরণ ও ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর পার্টির সম্পাদকমণ্ডলী ও সিসি থেকে আমার পদত্যাগপত্রের হুবহু নকল। এই দুইটি ঐতিহাসিক ডকুমেন্টে আমার রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমিও না। ভুল করেছি। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। সাধারণ মানুষের সাথেই থেকেছি, তাদের মাঝেই মিশে গেছি।

ধন্যবাদসহ

মনজুরুল আহসান খান
৯ জানুয়ারি ২০২৩
ঢাকা, বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সাথে আলাপ করতে গিয়ে প্রায়ই রাজনীতির কথা উঠত। তারা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইত। আমি যতদূর সম্ভব রাখঢাক না করে খুলে বলতাম। সে সব কথা সকলে আগ্রহ নিয়েই শুনত। তারা প্রায়ই বলত, এসব ঘটনা লিখে যাওয়া দরকার, যাতে ইতিহাসে যথাস্থানে রাখা যায়। কার নাম উল্লেখ করব! বলা যায় অনেকেই তো আমাকে আত্মজীবনী লেখার জন্য বারবার উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু লেখার সময় কোথায়? কোথাও থেকে ডাক আসুক না-আসুক আন্দোলনের প্রয়োজনে সারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচের মানুষের কাছে, সহকর্মীদের কাছে সমাজ বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে আমি ছুটে গিয়েছি। তবে করোনা যখন আমাকে ঘরে একপ্রকার বন্দি করে ফেলল, তখন আত্মজীবনী লেখাই আমার কাজ মনে করে লেখা শুরু করি। আমার মেয়ে সুমনা লেখার তাগাদা দিয়ে ছায়ার মতো আমার পিছে লেগে ছিল। এমনকি আমি গ্রামের বাড়িতে গেলেও সুমনা খাতা-কলম সঙ্গে দিয়েছে এবং ফোন করে লেখার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আমি আত্মজীবনী লিখছি দেখে কমরেড জলি আমার অজান্তেই নিজে থেকেই আদর্শ প্রকাশনীর প্রতিনিধিকে আমার মেয়ের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়। লিখতে তিন বছরের বেশি সময় লেগে যায়। অনেক দিন আগের ঘটনা বলে দিন-তারিখ ঠিক স্মরণ করতে পারিনি। কোনটা আগে কোনটা পরে সেটাও মেলাতে পারিনি। গোপন সামরিক কারাগারে ইন্টারোগেশনের ইংরেজি বিবরণের বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছেন কমরেড সজীব। এ বইতে ব্যবহৃত অন্যান্য ছবিগুলো যত্ন করে নিজের সংগ্রহে রেখেছিল আমার ছোটোভাই বদরুল আহসান খান। এদের সবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।

যারা আমাকে উৎসাহ দিয়েছে, তাদের সবার কাছে আমি ঋণী। গোটা পাণ্ডুলিপিটি মূলত সুমনা নানা সময়ে কম্পিউটারে কম্পোজ করেছে। পরে আমি দেখে দিয়েছি। তারপরও তথ্যের কোনো ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে মর্মে আমি কথা দিচ্ছি। এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা আশা করছি।

বিনীত
মনজুরুল আহসান খান

§

১৯৪৫ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ প্রান্তে এসে দুর্বার হয়ে উঠছিল। এই সময় ২৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ভোরে কলকাতার জোড়া গির্জার পেছনে এগারোর এক তাঁতিবাগানের দোতলায় একটি ফ্ল্যাট বাসায় আমার জন্ম।

আমার মায়ের নাম বদরুন্নেসা খানম এবং বাবার নাম আব্দুল ওয়ারেস খান। বাবা সরকারি চাকরি করতেন। সিভিল সাপ্লাইয়ের ইন্সপেক্টর। এক ফ্লাটে দুই পরিবার থাকত। ফ্লাটের সামনের অংশে থাকতেন আমার খালা, সঙ্গে তার স্বামী ও দুই মেয়ে। এই খালারই সেজো মেয়ে তাজিম এখন আমার স্ত্রী। খালার ছেলে সেলিমের জন্ম ঢাকায়, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি। আমি আমার বাবার মেজো ছেলে। আমার আগে আমার বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান এক বছর না হতেই মারা যায়। তার কবর হয় গোবরা কবরস্থানে। সেখানে সোহরাওয়ার্দী পরিবারের জন্য একটি রিজার্ভ জায়গা ছিল। আমার মা ও বাবা উভয়ের মামা মোসাহেব আলী খান সোহরাওয়ার্দী পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মায়ের কবরও ওই প্লটেই দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমার মাকে নিয়ে কলকাতার এগারোর এক তাঁতিবাজারে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মাকে নিয়ে গোবরা গোরস্থানে বড়ো ভাইয়ের কবর জিয়ারত করতে গিয়েছিলাম।

আমার বাবা কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ ও পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সেখানেই চাকরি এবং সংসারজীবন শুরু করেন। আমার মোসাহেব নানা, জামালপুর ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় যারা পড়াশোনা করতে যেতেন, তাদের সকলের অভিভাবক ছিলেন। তখন ময়মনসিংহ বা অন্য জেলা থেকে ঢাকায় যাওয়ার তেমন চল ছিল না। সে সময় পূর্ব বাংলার শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় যেতেন। নানার বাড়ি ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহে। জেলার মুসলমান ছাত্রদের ওই বাড়ি ছাড়া আর অন্য কোনো আশ্রয়ের জায়গা ছিল না। সেই কারণে ওই জেলার ছাত্ররা বেশির ভাগই নানার বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। তারা নানার বাড়িতে থেকেই কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, জেনারেল খলিল, আমার বড়ো মামা

সিরাজুল হক খান, বাবা আব্দুল ওয়ারেস খান এবং আরও কয়েকজন ছাত্রাবস্থায় নানার বাসায় থেকে পড়াশোনা করেছেন। নানা ছিলেন বটবৃক্ষের মতো, সকল ছাত্রের পিতাদের সাথেও নানার ভালো পরিচয় ছিল। ওনাদের বাসা থেকে খরচ পাঠালে সেটা নানার কাছে জমা থাকত। নানা পরে ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলের সুপার ছিলেন। আমার বাবার চার ভাইয়ের দুই ভাই কলকাতায় বাবার সঙ্গেই থাকতেন। আমার নানা কলকাতায় বাড়ি কিনে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকও বাড়ি কিনেছিলেন। নানা পূর্ব বাংলার সবারই যেন অভিভাবক ছিলেন। এদের সবারই স্বপ্ন ছিল কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। কিন্তু সবই ওলটপালট হয়ে গেল।

ইংরেজ সরকারের উসকানি, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের ভেতরের সাম্প্রদায়িক শক্তির চক্রান্ত, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এ সংঘাতকে স্থায়ী রূপ দিলো। 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এ বহু মুসলিম ও হিন্দু মারা গেল। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। দেশ ভাগ হয়ে গেল। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম হলো। আমার বাবা এবং অন্য অনেকেই সংসার নিয়ে পূর্ব বাংলায় চলে এলেন। আমার নানা মোসাহেব আলী খান কলকাতার মায়া ছাড়তে পারলেন না। উনি তখন কলকাতা করপোরেশনের লাইসেন্স অফিসার ছিলেন। বেশ কয়েক মাস পরে তিনি একদিন তার অফিসের টেবিলের ওপরে একটা চিরকুট দেখতে পেলেন; সেখানে লেখা 'কুইট ইন্ডিয়া', ভারত ছাড়! এরপরে নানা আর কলকাতায় থাকা নিরাপদ মনে করলেন না।

§

তিনি কলকাতার বাড়ির সাথে ঢাকার এক হিন্দু বাড়ি ও সম্পত্তির অদল-বদল করলেন। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তিনি ঢাকায় এলেন। পাকিস্তানের পক্ষে তিনি ছিলেন না। তিনি মওলানা আজাদের ভক্ত ছিলেন এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আমার বাবা, চাচা, মামা অর্থাৎ তখনকার যুবকরা সবাই পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আর আমার বাবা একই কলেজে পড়তেন। শেখ সাহেবও পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, তা ছাড়া পাকিস্তান দিবসে মিছিল ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন। এসব থেকে বোঝা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগে জনসমর্থন কী-রকম ছিল এবং তা সেই সময়ে কতটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

নানা ঢাকার শান্তিনগরের চামেলীবাগে একটি বাসা ও বেশকিছু জমি পান। সে সময় এলাকাটা ছিল গ্রামের মতো গাছপালা ও খেতখামারে ভরা। নানার একটা দালান ছিল। হিন্দুবাড়ি, নাম ছিল 'স্মৃতি তীর্থ তপোবন'। আম্মার আগ্রহ ও নানার পীড়াপীড়িতেই আমার বাবা এখানেই এক বিঘার কিছু কম জমি কেনেন। পরে

এখানে টিনের ঘর তোলা হয়। নানার ছেলেমেয়ে এবং আমার বড়ো মামাও ঘর তোলেন। এখন আমরা সবাই এখানেই থাকি।

আমার বাবা পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) এসে প্রথমে মা ও আমাকে (তখন কোলের শিশু) এবং আমার বাবার দুই ভাইকে দাদার বাড়ি, গ্রাম কুলকান্দী, থানা ইসলামপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহে রেখে আসেন। বাবার পোস্টিং হয় চট্টগ্রামে কনজিউমার গুডসের অধিদপ্তরে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর হিসেবে। চট্টগ্রামের রিয়াজুদ্দীন বাজারের এক বাসায় আমরা উঠি। বেশ বড়ো বাসা ছিল। আমার দুই চাচাও সেখানে থাকতেন। কলকাতা থেকেই আমাদের বাসায় নোয়াখালী জেলা থেকে আসা এক কাজের ছেলে ছিল, নাম হালিম। ওর বয়স আমার থেকে সামান্য বেশি ছিল। হালিম বৃদ্ধ ও অচল না হওয়া পর্যন্ত বাবার সাথেই ছিল এবং পরে বাবার অর্ডারলি পিওন হিসেবেও কাজ করেছে এবং পেনশনসহ অবসর নিয়েছে।

চট্টগ্রামে স্কুলে প্রথম ভর্তি করা হয় আমাকে। যেটুকু মনে আছে, আমাকে প্রথমে সেন্ট প্লাসিড স্কুলে ভর্তি করা হয়। পরে কোর্ট পাহাড়ের পাদদেশে জুবিলি স্কুলে ভর্তি হই। চট্টগ্রামের বাসায় একটা গ্রামোফোন ছিল; মেকানিকাল পিন দিয়ে বাজাত। হ্যান্ডেল মেরে স্প্রিং টাইট দিয়ে বাজাতে হতো। শচীন দেব বর্মণের অনেক রেকর্ড ছিল, হিজ মাস্টার্স ভয়েসের। তখন সেসবই ছিল আধুনিক। এ ছাড়া সায়গলের গান, আব্বাসউদ্দীনের গানও ছিল। অক্ষরজ্ঞান তেমন না থাকলেও আমি রেকর্ড ঠিকই চিনতাম। আব্বা যখন যেটা বাজাতে বলতেন, সেটাই বাজাতাম। 'পদ্মার ঢেউরে', 'জাগো অনশন বন্দী ওঠোরে যত', 'ও বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে', 'আল্লা মেঘ দে পানি দে'—এমন সব বিখ্যাত গান। সকালে রেডিয়ো চলত। ক্লাসিক্যাল, খেয়াল বাজত। রেডিয়ো পাকিস্তান ঢাকা থেকে অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে বিগবেনের মিউজিক ও ঘণ্টা বাজত। ওটা আমার খুব প্রিয় ছিল।

চট্টগ্রামের একটি ঘটনা খুব মনে পড়ে। আমার ফুপাতো বোন নুরী বুবু (আর্কিটেক্ট স্বপনের মা) আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। একদিন ভেতরের আঙিনায় পানির ড্রামের নিচে আমি উপুড় হয়ে পানি ধরতে চেষ্টা করছিলাম। একসময় ড্রামের ভেতর পড়ে গেলাম। নুরী বুবু জানালার পাশে বসে ছিলেন। তিনি ছুটে এসে আমাকে উদ্ধার করেন। আমার হাত-পায়ের আঙুল সাদা হয়ে গিয়েছিল।

চট্টগ্রামে থাকতেই একসময় আমার ছোটো মামা মোস্তাফিজুর রহমান খান (যিনি উদীচীর প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক, প্রয়াত মোস্তফা ওয়াহিদের বাবা ও ময়না মাস্টার হিসেবে আমার নানার বাড়ি চন্দনবইসা, বগুড়ায় বিখ্যাত) সপরিবারে চট্টগ্রামে আমাদের সাথে থাকতে আসেন। একসময় বাসার সামনে দেওয়ালঘেঁষে তিনি একটা মুদির দোকান দেন। সেই ব্যাবসা নিয়ে আমরা খুব মজা করেছিলাম। আমার ছোটো মামার বড়ো ছেলে ওলিদ ওই বাসাতেই করোনারি থ্রম্বোসিসে মারা যায়। ওই বাসাতেই আমার ছোটো ভাই নজমুল, বদরুল ও কামরুলের জন্ম হয়। চট্টগ্রাম থেকেই আমার মেজো চাচা আব্দুল হামিদ খান পাকিস্তানের বিমান বাহিনীতে যোগ দেন।

সমুদ্রগামী জাহাজে করাচি যাওয়ার সময় আব্বার সে কী কান্না! মেজো চাচা বিমান বাহিনীতে জেট জঙ্গি বিমানের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেন। ছুটিতে পাকিস্তান থেকে তিনি বিমানে আসবার সময় আমাদের জন্য উপহার নিয়ে আসতেন। আব্বার জন্য স্যুট, আমার জন্য ওর্সটেড ফুল প্যান্ট, হাতঘড়ি, কোডাক বক্স ক্যামেরা। সেগুলো আমার জীবনের প্রথমও বটে।

মনে পড়ে যখন আমরা রংপুরে ছিলাম, তখন মেজো চাচা আমাকে নিয়ে মর্নিং শো দেখতে যেতেন। ইংরেজি ছবি। তিনি আমাকে বিমান কীভাবে চলে ছবি এঁকে তা বোঝাতেন। একটা খাতাও কিনে দিয়েছিলেন। এইভাবে আমার পাইলট হওয়ার আগ্রহ বেড়ে গেল।

মেজো চাচা আমাদের ছেড়ে চলে গেলে আমি কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলতাম। সিনেমা দেখাও বন্ধ। রিটায়ার করার পর ঢাকায় ফিরে আসলে '৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তাকে ডেকে পাঠানো হয়। আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি ওয়াপদাতে চাকরি নেন।

১৯৫১ সালে আব্বা ঢাকায় বদলি হয়ে যান। পুরনো জায়গা ছেড়ে যাব, তাই আমার মন খুব খারাপ। আমার বড়ো চাচা এমদাদুল হক খান গান বানালেন, 'আমি যাব ঢাকায় যাব/ মামুন, খোকাকে হারাব তো নাসিমকে তো পাব!' নাসিম মানে আমার খালাতো বোন, সেলিমের বোন, কলকাতায় আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমার এই বড়ো চাচা (সিপিবি নেতা আহসান হাবীব লাবলুর বাবা) চট্টগ্রামে 'শ ওয়ালেস' কোম্পানিতে কাজ করতেন এবং সেখানকার ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ছিলেন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষে আমি একাই চট্টগ্রামে যাই। চাচা তখন নালাপাড়ায় সপরিবারে থাকতেন। চাচা ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। আমাকে পাঠাগার থেকে বই এনে দিতেন। ওখানেই হাসুলি বাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন, রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প, নজরুলের সঞ্চিতা পড়ে ফেলি। উনি আমাকে কোর্ট পাহাড় এবং বাটালী হিলে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। কোর্ট পাহাড়ে মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি হয়েছিল। তিনি সেই কাহিনি আমাদের বলতেন। পরে শুনেছি, বড়ো চাচা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তার সহকর্মী সালাম সাহেবও পার্টির সঙ্গে ছিলেন। সালাম সাহেবের মেয়ে লিপির সাথে পরে আমার ছোটো ভাই বদরুলের বিয়ে হয়।

আমার সাহিত্যানুরাগের ব্যাপারে বড়ো চাচার অবদান সবচেয়ে বেশি। আমার মেয়ে সুমনাকে সাহিত্যে অনুরাগী করার ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিল।

কামরুল তখন দশ দিনের ছেলে। আমরা চট্টগ্রাম থেকে পিআইয়ের বিমানে ঢাকায় এলাম। তখন ভাড়া ছিল দশ টাকারো কম। ১৯৭১ সনেও, মনে আছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম বিমান ভাড়া ছিল তিরিশ টাকা। ঢাকায় এসে আমরা ৩৬ তোপখানা রোড, পুরানা পল্টনে উঠলাম। সচিবালয়ের উত্তর দিকে দোতলায় আমরা থাকতাম। নিচের তলায় আব্বার অফিস। কন্ট্রোলার অব ঢাকা রেশনিং। বিশাল বাড়িতে

বসবাস। ছাদের ঘরে থাকতেন আমার ফুপু হাজেরা খাতুন। সিঁড়ির ঘরে থাকতেন আমার ছোটো চাচা এনামুল হক খান (পরে সেনাবাহিনীর জেনারেল) এবং আমার বড়ো খালার ছেলে আহসানুল হক (পরে সোনালী ব্যাংকের এমডি)। বাড়িটি ছিল আগের আমলের বাড়ি। খড়খড়িওয়ালা জানালা। তখন সব বাড়িতেই এই রকম। এখন ওই রকম বাড়ি ঢাকায় দেখাই যায় না। কলকাতায় প্রচুর আছে। ঢাকায় ওই রকম কিছু বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত ছিল।

নিচতলায় বিল্ডিং থেকে একটু দূরে রান্নাঘর, পায়খানা। এখন ভাবি, আব্বা-আম্মা কী করে বারবার ওপর থেকে নিচে নামতেন। এক ইরানি মাঝবয়সি মহিলা ঝুড়ি মাথায় মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় খাসির মাংস বিক্রি করতে আসতেন। বাসার এলাকার মধ্যেই ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা ছিল। ছোটো চাচা, তার বন্ধু গিয়াস (একসময়ের 'মিস্টার ঢাকা') ও বল্টু চাচা (পরবর্তীকালে সচিব) খেলতে আসতেন। আমরা একটু-আধটু খেলতাম। তখন গাড়ি-ঘোড়া খুব কম ছিল। রিকশাও কেবল চালু হচ্ছে। বেশির ভাগ ছিল ঘোড়ার গাড়ি। ওগুলোতেও খড়খড়ির জানালা। বেশির ভাগই ছিল সার্ভিস ল্যাট্রিন। ময়লা পরিষ্কার করার জন্য এখনকার ওয়াসার পানির গাড়ির মতো গোরু বা মহিষের টানা গাড়ি ব্যবহার করা হতো। ওগুলিকে নাজিমুদ্দিনের গাড়ি বলা হতো। কারণ, নাজিমুদ্দিন ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার (তখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ব বাংলাই বলা হতো) গভর্নর। ওই গাড়ি দেখলে সবাইকে নাক-মুখ ঢাকতে হতো। আমাদের সময় ছিল প্রচুর। আমরা সময় কাটাতাম নানা খেলা আবিষ্কার করে। একটা খেলা ছিল, আমরা নাসিম আপা, শামীম আপাকে নিয়ে ছাদে যেতাম। প্রতিযোগিতা করতাম কার দিক থেকে কয়টা মোটর গাড়ি আসে। তোপখানা রোড এখন ব্যস্ততম রাস্তা। কিন্তু তখন গাড়িই ছিল কম। দু-তিন ঘণ্টায় চার-পাঁচটা গাড়ি একদিক থেকে চলত। কাছেই আব্বাসউদ্দীন সাহেব, ড. কুদরত-ই-খোদা এবং কাজী মোতাহার হোসেনের বাসা। ওনারা সকালবেলা ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন। তিনজনের হাতেই লাঠি থাকত। আব্বাসউদ্দীন সাহেবের সাথে কলকাতা থাকতেই আমার আব্বার পরিচয় ছিল। আমি আব্বার সাথে তার বাসায় গিয়ে ওনার গান শুনেছি।

বড়ো সংসারে আমার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন হাজেরা ফুপু। উনি আমাকে আদর করে ভাত খাওয়াতেন। আমাকে চোখ বন্ধ করতে বলতেন। কে খায়, কে খায়, মুরগির ডিম, হাপুস! এইভাবে সব খেয়ে শেষ করতাম। শেষে যখন থালা মুছে চাচি খাওয়াতেন, তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। আম্মা ও চাচি খাওয়াতেন। তোপখানা রোডের বাড়ির পাশেই একটি পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। গেটে পুলিশ ডিউটি করত। আমি সকালে গিয়ে পুলিশের সাথে কথা বলতাম। উনি আমাকে প্যারেড শেখাতেন। ওনার সাথে কথা বললে আমার মেজো চাচা, যিনি বিমান বাহিনীতে কাজ করতেন, তার কথা মনে হতো। আমার বড়ো চাচা এমদাদুল হক খানের সাথে আমার সবচেয়ে ছোটো খালা শিরীন খালার বিয়ে হয় তোপখানা রোডের বাসায়। খালা এসে উঠেছিলেন গোপীবাগে আমার মেজো খালার বাসায়। ছোটোবেলায় সেই প্রথম বিয়ের অনুষ্ঠান। বড়ো মজা করেছিলাম।

আমাদের বাড়ির কাছেই সেগুনবাগিচা প্রাইমারি স্কুলে আমি পড়তাম। এখন মনে পড়ে, বাসার পাশের যে গলি দিয়ে স্কুলে যেতে হতো, সেখানে আমাদের বাসার নিচে একটি মেয়ে অপেক্ষা করত। ওপরে বারান্দায় আম্মাই আমাকে তৈরি করে দিতেন। আমি নিচে নামলে মেয়েটিও আমার সঙ্গে স্কুলে যেত। ও নিচের ক্লাসে পড়ত। প্রতিদিনই স্কুলের সময় ও আমাদের বাসার নিচের গলিতে এসে দাঁড়াত। হাতে মাঝে মাঝে একটা ফুলও থাকত। হাজেরা ফুপু ওকে দেখলে মুচকি হাসতেন। মেয়েটির বাড়ি সম্ভবত প্রেসক্লাবের পেছনে একজন বিচারপতির বাড়ি। সম্ভবত ওরা হিন্দু ছিল। আমি ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন যত বয়স বাড়ছে ততই এ রকম মিষ্টি স্মৃতিগুলোর কথা মনে পড়ে।

আমরা ওই বাসায় থাকতেই দক্ষিণ দিকে সচিবালয়ের টিনশেডে আগুন লেগেছিল। সম্ভবত ১৯৫৫ সালে যখন ব্রিটিশরা সুয়েজ খাল দখল করে নেয়, তখন জনতা পল্টনের ব্রিটিশ কাউন্সিলে আগুন লাগিয়ে দেয়। রাতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল। সেসময় সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ না-কি হুমকি দিয়েছিলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশরা যদি সুয়েজ খাল থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার না করে তাহলে লন্ডন বলে কোনো শহর পৃথিবীর মানচিত্রে থাকবে না!

ওই বাড়িতে থাকতে লন্ডন ওভাল স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলার কমেন্ট্রি শুনতাম রেডিয়োতে আব্বার সাথে রাত জেগে। পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের টেস্ট খেলা। পাকিস্তান জিতেছিল। ফজল মাহমুদ না-কি খুব ভালো গুগলি বোলিং করেছিল। কমেন্টেটর ওমর কোরশি বলেছিল, ইংল্যান্ড হ্যাজ বিন ফজল্ড।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গুলি ও হত্যার প্রতিবাদে পরদিন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়। মনে পড়ে, আব্বা গাড়ি করে অফিসের কাজে বাইরে গিয়ে ফিরে এলেন। বললেন, ছেলেরা গাড়ি নিয়ে যেতে দেয়নি।

পল্টনের বাসায় থাকতে এক রাতে আমাদের ফোন বেজে উঠল। আমি ফোন ধরলাম। ওপার থেকে ভারী গলা, ওয়ারেস আছে? আমি আব্বাকে ফোন দিলাম। উনি কথা বললেন। আব্বা ফোন ছেড়ে আমাকে জানালেন, পূর্ব বাংলার গভর্নর শেরে বাংলা ফজলুল হক ফোন করেছিলেন। আব্বার অফিসে তিনজন অফিসার নিয়োগ করার কথা ছিল। শেরে বাংলা সাতজনের নাম সুপারিশ করেছিলেন। আব্বা বললেন, তিন জনের নিয়োগ দেওয়া হবে; সেখানে সাতজনের জন্য সুপারিশ করেছেন স্বয়ং গভর্নর। আব্বার এই কথা কীভাবে যেন শেরে বাংলার কানে গিয়েছিল, তাই তিনি ফোন করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি জনপ্রতিনিধি। আমি আমার কাজ করেছি, তুমি তোমার কাজ করো। শেরে বাংলার সাথে কলকাতা থেকেই আব্বার পরিচয়। তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। মাঝে মাঝে উলটা-পালটা কাজ করলে ছাত্ররা খেপে যেত। তখন তাদের কাছে তিনি মাফ চাইতেও দ্বিধা করতেন না, এখনকার যুগে এ দৃষ্টান্ত বিরল। এসব কারণে বঙ্গবন্ধুও শুরুর দিকে অনেক সময় তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন। শেখ সাহেব তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তার বাবা-মা দুজনই শেখ সাহেবকে বারণ করেছেন শেরে বাংলার